শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এদেশের কৃষি উন্নয়নের সূতিকাগার

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

সেদিন ছিল ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর। অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক তৎকালীন ঢাকার অদূরে তেজগাঁয়ে 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট'- (বিএআই) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেটিই ছিল বাংলায় অর্থ্যাৎ এ দেশের প্রথম কৃষির উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনশ একর জমিসহ এক বড়সড় ক্যাম্পাসই ছিল সেটি। প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে এখানে যোগ দিয়েছিলেন মি. ডি. ক্লার্ক। কৃষি নিয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, ছিল উদ্যোমও। দশ জন মুসলমান আর দশ জন হিন্দু ছাত্র ভর্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এর শিক্ষা কার্যক্রম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদীয় মর্যাদায় বিএআই-এর যাত্রা শুরু হয়। পরপর কয়েক বছর হিন্দু মুসলমান ছাত্র ১০ জন ১০ জন করে ভর্তি কার্যক্রম চলে। প্রথম ২০ জন ছাত্র কৃষি গ্রাজুয়েট হিসাবে ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৪৩ সালে। ১৯৬১ সাল থেকে ৮০ জন ও ১৯৭১ সাল থেকে এখানে প্রতিবছর ১২০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। হাতে কলমে সে সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হতো। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা তখন সমান গুরুত্ব পেতো। বিএআই-এর পাশেই দক্ষিণ দিকে সংসদ ভবন এলাকা জুড়ে ছিল কৃষি ফার্ম। চারশ তিন একর জমি নিয়ে সে ফার্মের গোড়াপত্তন করা হয় ১৯০৮ সালে। এরই পাশে বিশাল নিজস্ব ক্যাম্পাস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বিএআই। হাতে নাতে শিক্ষার এক বিস্তৃত ফার্ম ও গবেষণা মাঠ ছিল তখন এখানে। মূলত ফসল কৃষির নানা বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হতো। বিএআইতে প্রদত্ত কোর্সটি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ে আই.এসসি. পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র হিসাবে এখানে দুই বৎসর মেয়াদী বি.এসসি. (এজি) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিএআইতে আবাসিক ছাত্র হিসাবে দুই বৎসর শিক্ষা গ্রহণের পর বি.এজি. ডিগ্রী দেয়া হতো। ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষা বছর হতে আই.এসসি পাশের পর এখানে ত্রিবার্ষিক বি.এজি. ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আগের নিয়মে চার বৎসর মেয়াদী কোর্সটিও চলে। ১৯৫১ সাল থেকে এখানে এম.এজি. চালু করা হয়। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মোট ২৫ বৎসর পর্যন্ত উচ্চতর কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিএআই ছিল এদেশে একক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই একে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার সূতিকাগার এবং পূর্ব বাংলার কৃষি শিক্ষার একমাত্র বাতিঘর বলে চিহ্নিত করা হয়।

এখান থেকে ডিগ্রী অর্জন করে এখানকার কৃষি গ্রাজুয়েটগণ নানা রকম পেশায় যোগদান করেন। শিক্ষকতা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল পেশায় নিয়োজিত হন গ্রাজুয়েটগণও। কেবল দেশে নয় বিদেশেও এখানকার গ্রাজুয়েটগণ সুনামের সাথে নানা দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হন। এদেশের কৃষির সকল ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন এখানকার গ্রাজুয়েটগণ। আজকে বাংলাদেশের কৃষির যে উল্লম্ফন ঘটেছে এর পেছনে নেপথ্যে থেকে অনুক্ষণ যারা কাজ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং কর্ম কৌশল নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন তাঁদের প্রায় সবাই আমাদেরই গ্রাজুয়েট। স্বাধীনতা উত্তর কালে ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে এদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনকে এক নতুন মাত্রায় যারা উন্নীত করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ড. শাহ মোঃ হাছানুজ্জামান, ড. নূর মোহাম্মদ মিয়া, ড. মুন্সী সিদ্দিক আহম্মদ, ড. হামিদ মিয়া প্রমূখ। গম নিয়ে নিরবধী কাজ করে যারা দেশের জন্য উচ্চ ফলনশীল গম জাত উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ড. আবদুর রাজ্জাক এবং ড. হেলাল-উল-ইসলামের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এদেশের পাট গবেষণার ক্ষেত্রে ড. কাশেম আলী, ড. মোশাররফ হোসেন, আব্দুল ওহাব উজ্জ্বল সব নাম। ড. মামুনুর রশীদ, ড. আমজাদ হোসেন, ড. এ এস এম কামালুউদ্দিন ও ড. কামালুউদ্দিন আহাম্মদ এদেশের গোলআলু, সবজি ও ফল গবেষণার পথিকৃৎ। তৈল জাত ফসল গবেষণায় জনাব এ খালেক, ড. আলি আকবর প্রমূখ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং কৃষি ব্যবস্থাপনায় যারা এদেশের কৃষিকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একান্তই যাদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা, ড. মতলুবুর রহমান, ড. মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, জনাব ইয়াসিন আলী, ড. শরাফত হোসেন খান প্রমূখ। তাঁদের শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং কর্ম নিষ্ঠার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কৃষি প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ তথা বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল এক্সটেনশন রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট

ইনস্টিটিউট তথা সার্ডি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জনাব শহিদুল ইসলাম, ড. আইয়ুবুর রহমান, জনাব মুন্সী সিদ্দিক আহম্মদ, জনাব এ কে এম এ কিবরিয়া, জনাব একেএম গিয়াস উদ্দিন মিল্কী প্রমূখ এদেশের কৃষি সম্প্রসারণকে এক ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হন। ড. আলতাফ আলী, ড. নূরুল ইসলাম, ড. সানাউল্লাহ, জনাব কিবরিয়া প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ এদেশের কৃষি পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। কৃষি শিক্ষা পদ্ধতি উন্নয়ন এবং উচ্চতর কৃষি শিক্ষার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যারা দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জনাব সুলতান আহম্মেদ খান, জনাব নূরুল ইসলাম, ড. আবদুল লতিফ মিয়া, ড. আই এইচ খান, ড. এম. এ. কুদ্দুস, ড. আকবর হোসাইন, ড. গোলাম আলী ফকির, ড. এম. এ. হাসনাত, ড. এ. এম. শামুসদ্দিন, জনাব মোসলেহউদ্দিন আহমেদ, জনাব সিরাজুল হক, সিরাজুল ইসলাম বার ভূঁইয়া, ড. লুৎফর রহমান প্রমূখ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষি গবেষণায় যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা, ড. সামসুল হক এবং ড. শাহ্ মোঃ হাসানুজ্জামানের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

এদেশে কৃষি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন যে ক'জন কৃষি গ্রাজুয়েট তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন জনাব মোস্তফা আলী, জনাব কলিম উদ্দিন আহম্মদ, ড. এস এম কালামউদ্দিন, ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, ড. মামুনুর রশিদ, ড. মোঃ মতিয়র রহমান, ড. শাহ মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, ড. মোঃ হাসানউল্লাহ, ড. নওয়াজেশ আহমেদ, জনাব ইয়াসিন আলী, জনাব মোহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া, ড. সিদ্দিক আলী মিয়া, ড. শাহজাহান প্রমূখ। বলাবাহুল্য, এতক্ষণ যেসব কৃষি গবেষক, কৃষি সম্প্রসারণবিদ, কৃতি শিক্ষক, কৃতি কৃষি ব্যবস্থাপক ও সংগঠক, কৃতি কৃষি লেখকের কথা উল্লেখ করলাম তাঁরা সকলেই 'বিএআই' এর গর্বিত গ্রাজুয়েট। তাঁদের অনেকেই কৃষিতে অনন্য অবদানের জন্য পাকিস্তান আমলে যেমন বাংলাদেশ আমলেও তেমনি একাধিক পদক লাভ করেছেন। আমাদের গর্বিত গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ড. শাহ মোঃ হাসানুজ্জামান এবং ড. কাজী বদরুদ্দোজা দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক 'স্বাধীনতা দিবস' পদক অর্জন করেছেন। দেশের এ দু'জন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে সরকার 'সায়েন্টিস্ট এমিরেটাস' হিসেবে সম্মানিত করেছেন। এদেশের সাধারণ মানুষতো বটেই অনেকেরই জানা নেই যে, আমাদের ইনস্টিটিউটের গ্রাজুয়েটদের হাত ধরেই নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেছে এদেশের নানা রকম কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহ। এগিয়েছে এ দেশের কৃষি গবেষণা ও কৃষি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। বিএআই-এর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাঁদেরসহ আমাদের আরো বহু গ্রাজুয়েটদের আজীবন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই।

বিএআই-এর একাডেমিক উৎকর্ষতা বেশ খানিকটা ভাটা পড়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৪ সালে এর অনুষদীয় মর্যাদার পরিবর্তে একে অধিভূক্ত ইনস্টিটিউট হিসাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তির কারণে। এটি একটি আবেগ সম্বলিত কিন্তু বড় রকম এক ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক স্বাধীনতা ব্যাহত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একই সিলেবাসে রেপ্লিকা ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ এতে ব্যাহত হয়। অন্যদিকে এর প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপর যা বাস্তবায়িত হতো বিএআরআই-এর মাধ্যমে। বলা যায় ত্রিবিধ টানাপোড়েন আর শিক্ষকদের ট্রান্সফার ভীতি এর শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সীমাবদ্ধ গন্ডিতে আটকে দেয়। এর ঐতিহ্য ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সব কিছুর উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেবার আলোচনাও এক পর্যায়ে শুরু হয় বিএআরআই কর্তৃপক্ষ আর তৎকালীন সরকারের মধ্যে। বিএআই কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে প্রায়শই অনবগত থাকে। ঢাকা ফার্মের জমিসহ বিএআই-এর অনেক জমি সংসদ ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্য হস্তান্তর করেছিল বিএআরআই-এর মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়। ফলে এই ইনস্টিটিউটের জন্য থাকলো ৮৬.০২ একর জমি। এর মধ্যে হঠাৎ ১৯৮৫ সালে এসে এর স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। বোঝা যায় একে সরিয়ে নেবার একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এ পর্যায়ে ১৯৮৫ সালে গাজীপুরের সালনায় বিএআরআই কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে চালু করা হয় 'ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ' বা ইপসা। সিনিয়র কৃষিবিদদের প্রবল সমালোচনার মুখে বিএআই এর নিজস্ব ঠিকানায় টিকে যায়।

শিক্ষার এরকম ক্রম অবনতিশীল এক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ছুটে বেড়ায় শিক্ষকগণ শিক্ষক সমিতির ব্যানারে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সে সময় এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, কৃষিবিদ আবদুল মান্নান এবং ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষিবিদ মহবুবুজ্জামান। বিশেষ করে আমাদেরই গ্রাজুয়েট আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আন্তরিকতার ফলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়'। ত্রিবিধ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি লাভ করে বিএআই। শুরু হয় এক নতুন অভিযাত্রা। নতুন উদ্যোমে সেমিস্টার সিস্টেমে চালু হয় এর স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং এক সময় চালু হয় এখানে পিএইচডি কোর্স। কৃষি অনুষদ দিয়ে শুরু হয় এর যাত্রা বটে, তবে ২০০৭ সালে এখানে চালু করা হয় এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ। ২০১২ সালে এখানে এনিম্যাল সায়েন্স ও ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের আওতায় চালু হয় বি.এসসি.ভেট সায়েন্স এন্ড এ.এইচ. কোর্স। ২০১৭ সালে চালু করা হয় বি.এসসি ইন ফিশারিজ (অনার্স) কোর্স শুরু হয় ফিশারিজ, একোয়াকালচার এন্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের আওতায়। মোট ৩২২ জন শিক্ষককের

মাধ্যমে ৩৫ টি বিভাগের অংশগ্রহণে চলছে এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি মিলে এখানে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এখন ৪৭৭০ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগে স্নাতকোত্তর ও মোট ১০টি বিভাগে এখন পিএইচডি কোর্স চালু রয়েছে। গত দুই দশক ধরে বেড়েছে ছাত্র সংখ্যা, বেড়েছে শিক্ষক সংখ্যা এবং বাড়ছে গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যাও। স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি গবেষণায় অবিরত ব্যস্ত থাকে গবেষণা মাঠ। ফসলের নতুন নতুন বেশ কয়েকটি জাতও উদ্ভাবিত হয় এখানে। উদ্ভাবিত হয় একাধিক ফসল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিও। গড়ে তোলা হয় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (সাউরেস) এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বহিরাঙ্গন কার্যক্রম। বাড়তে থাকে পিএইচডি করা শিক্ষকের সংখ্যাও। বাড়ছে ছাত্রদের হল, ছাত্র-ছাত্রী বাড়ায় এখানে নির্মিত হচ্ছে নতুন দু'টি হল। বেড়েছে অনুষদ ভবন। চালু হয়েছে ইনস্টিটিউট অব সীড টেকনোলজী। চালু হয়েছে ছয়তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় গবেষণাগার। চলেছে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ। নির্মিত হচ্ছে বিশাল আয়তনের টিএসসি। এরই একটি অডিটরিয়ামের ধারণক্ষমতা এক হাজারেরও অধিক। নির্মিত হয়েছে নতুন শহীদ মিনার। নিমার্ণ কাজ চলছে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল সম্বলিত স্বাধীনতা স্মৃতি স্তম্ভের। একটি শক্তিশালী 'ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এসিউরেন্স সেল' এখানে রয়েছে। নানা ইস্যু নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কাজ করা হচ্ছে নিয়মিত। শিক্ষার মান চিশ্চিতকরণের জন্য 'আউটকাম বেজড কারিক্যুলা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সময়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় নতুন তিনটি বিষয়ে আন্তঃ অনুষদীয় স্নাতকোত্তর কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে। গবেষণা পরিচালনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ জোরদার করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কভিডকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য অফলাইন এবং অনলাইন ক্লাশ কার্যক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভাল গবেষক ও মূল্যবান গবেষণা পেপারের জন্য প্রণোদনা দেবার বিষয়টি চালু করার পর্যায়ে রয়েছে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা দেবার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। একটি ভাল শুরু এবং এর ধারাবাহিকতা আমাদের ধীরে ধীরে কাঙিক্ষত মানে নিয়ে পৌঁছাবে তেমনটি আশা করা যায়। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের মিলিত প্রয়াস এবং সহযোগিতা অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের পথ করে দিবে নিশ্চয়। শিক্ষা ও ভাবনার স্বাধীনতা এবং উত্তম নেতৃত্ব কৃষি শিক্ষার এই বাতিঘরের শৌর্য বীর্য যেমন ফিরিয়ে আনতে পারে, তেমনি এখানকার গ্রাজুয়েটগণ পারে আজকের ও আগামী দিনের কৃষির চাহিদা পূরণের জন্য কৃষির সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখতে। সন্দেহ নেই কৃষির চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেই আমাদের সাফল্য বয়ে আনতে হবে। সে পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পথ এখন আর খোলা নেই।

ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়